অনুবাদে প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চা

গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়

বিশ্ব সাহিত্যের রসাস্বাদনে অনুবাদের গুরুত্ব অপরিসীম তা নিয়ে সন্দেহ নেই। পৃথিবীর হাজার হাজার ভাষাতে যে সাহিত্য রচনা হয়ে চলেছে, অনুবাদের মাধ্যমেই তা আমাদের সকলের নাগালে আসে। উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ — সাহিত্যের সমস্ত শাখাপ্রশাখার অনুবাদেরই চাহিদা আছে। হয়তো তাদের সম্পূর্ণ রস অনুবাদে ধরা পড়ে না, কিন্তু যা পাই তাতে অন্তত কিছুটা মনের আশা মেটে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক ভাষা থেকে অনুবাদ অন্য ভাষাতে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে এমন ঘটনা নিশ্চয় বিরল নয়, কিন্তু তা সাধারণভাবে এক ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু বিশ্বের বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাসে অনুবাদের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। এই লেখাতে আমরা মূলত ভারতের প্রাচীন বিজ্ঞান কেমনভাবে অনুবাদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানচর্চাকে প্রভাবিত করেছিল তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

কেন এই বিশেষ বিষয়টিকেই বেছে নিয়েছি, তা বলার হয়তো একটা প্রয়োজন আছে। ইদানিং দেখছি বৈমানিক সূত্র বা বৈদিক গণিতের নাম করে একান্তই আধুনিক বইকে প্রাচীন ঋষিদের লিখিত বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের শীর্ষমহল থেকে প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে নানা উদ্ভট দাবি শোনা যাচ্ছে; উড়োজাহাজ থেকে টেলিভিশন, মাধ্যাকর্ষণ থেকে বিবর্তনতত্ত্ব, ক্লোনিং থেকে সূর্যকেন্দ্রিক জগৎ — এ সমস্তই নাকি প্রাচীন ভারতীয়দের জানা ছিল। দুঃখের হলেও বলতে হয় যে ইতিহাসকে অস্বীকার করে নিজের কল্পনাকে তার জায়গায় স্থান দেওয়ার এই প্রয়াসে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যোগ দিয়েছেন অনেক বুদ্ধিজীবীও। অনুবাদের মাধ্যমেই ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চা বিদেশিদের কাছে পৌঁছেছিল। সত্যিই কোন কোন ভারতীয় চিন্তা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ছাপ ফেলেছিল, এই সংক্ষিপ্ত লেখাতে আমরা তার কিছু পরিচয় পাব। একটা কথা বলে রাখি — মহাকাব্য বা পুরাণের মধ্যে বিজ্ঞানকে খুঁজতে চাওয়ার মতো আধুনিক আহাম্মকি প্রাচীন বিজ্ঞানীরা করেননি; যে সমস্ত বইয়ের অনুবাদের কথা বলা হবে, সেগুলি প্রকৃতই বিজ্ঞানের বই। এই লেখাতে আমরা ভারতীয় বইয়ের অনুবাদের আলোচনা করছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রাচীনকালেও জ্ঞানচর্চা কখনও একমুখী ছিল না, অন্য সভ্যতার দানেও পরিপুষ্ট হয়েছিল প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা। একটা উদাহরণ দিই, আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের সময় ভারত ও গ্রিক জ্ঞানচর্চার মধ্যে যোগাযোগ হয়েছিল; তার প্রমাণ রোমক সিদ্ধান্ত বা পৌলিশ সিদ্ধান্তের মতো সংস্কৃত জ্যোতিষগ্রন্থ যারা আসলে অনুবাদ।

প্রাচীন যুগ ও মধ্য যুগের বিজ্ঞানের মধ্যে যোগস্থাপন করেছিল অনুবাদ। প্রাচীন যুগ বলতে এখানে

আমরা মূলত গ্রিস ও ভারতীয় বিজ্ঞানের কথা বলছি। ব্যাবিলন ও মিশরের বিজ্ঞান গ্রিক ও পরবর্তীকালে রোমান জ্ঞানচর্চাতে স্থান করে নিয়েছিল, সচেতনভাবে সরাসরি অনুবাদ তাদের হয়নি। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে গ্রিক সভ্যতার পতনের পরে বিজ্ঞানের চর্চা স্তিমিত হয়ে আসে। তার স্থান নিয়েছিল রোমান সভ্যতা যা মৌলিক বিজ্ঞানের চর্চাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। আলেকজাণ্ডারের স্থাপিত মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া নগরী আরও কয়েক শতাব্দী গ্রিক সভ্যতার আলো জ্বালিয়ে রেখেছিল, কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেই তা নির্বাপিত হয়। একই রকম ভাবে ভারতবর্ষেও অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্যের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান ও কঠোর জাতপাত ব্যবস্থার পুনঃপ্রচলনের ফলে বিজ্ঞানচর্চা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এই বন্ধ্যা অবস্থা থেকে বিজ্ঞানচর্চাকে মধ্যযুগে উদ্ধার করেছিল আরব সভ্যতা। ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের পরের কয়েক শতাব্দীতে ভারত থেকে শুরু করে উত্তর আফ্রিকা এবং পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপ — এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিশেষ করে আব্বাসীয় খলিফাদের শাসনকালে বিপুল উদ্যমে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, শারীরবিদ্যা, ভূগোল — নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিজ্ঞানের নানা দিকে জোয়ার এসেছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আরবদের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার বিশেষ ঐতিহ্য ছিল না। বিজ্ঞানচর্চা শূন্য থেকে শুরু করা যায় না, তার এক ভিত্তি লাগে। সেই ভিত্তি স্থাপন করেছিল অনুবাদ।

একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন; আমরা আরব সাম্রাজ্য বলতে যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কথা বলেছি, তার অনেকটাই বর্তমান আরব ভূখণ্ডের বাইরে। তেমনি প্রথমদিকের অনুবাদকদের অনেকেই মুসলমান ছিলেন না, ছিলেন খ্রিস্টান, ইহুদি বা হিন্দু।

প্রশ্ন আসে, হঠাৎ আব্বাসীয় খলিফাদের রাজত্বকালেই অনুবাদের সূচনা হল কেন? এ নিয়ে পণ্ডিতরা একমত নন। কথিত আছে খলিফা আল-মামুন (শাসনকাল ৮১৩-৮৩৩ সাল) এক রাতে অ্যারিস্টটলকে স্বপ্নে দেখেছিলেন, তার পরে তিনি অ্যারিস্টটলের সমস্ত লেখা অনুবাদের নির্দেশ দেন। কিন্তু অনুবাদের সূচনা হয়েছিল তার অনেক আগে, আল-মামুনের ঠাকুর্দা আল-মনসুরের (শাসনকাল ৭৫৪-৭৭৫) সময়েই তা বিপুল এক প্রবাহের সৃষ্টি করেছিল। আল-মামুনকে স্বপ্ন দেখতে হলেও তো অ্যারিস্টটলের নাম জানতে হবে। তাই গল্প হিসাবে ভালো হলেও এর কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নেই।

উমাইয়া খলিফাদের সরিয়ে আব্বাসীয় বংশের শাসন শুরু হয় ৭৫০ সালে। তাদের প্রথম রাজধানী ছিল বর্তমান ইরানের কুফাতে, ৭৬২ সালে তা বাগদাদে স্থানান্তরিত হয়। আব্বাসীয় খলিফাদের আগে অনুবাদ নিশ্চয় হত, তবে তা আরবি ভাষায় নয়। সাসানীয় শাসনে সংস্কৃত থেকে পারস্য, অর্থাৎ বর্তমান ইরানের, পাহলভি (মধ্যযুগের ফার্সি) ভাষাতে, এবং বাইজান্টাইন বা উমাইয়াদ শাসনে গ্রিক থেকে সিরিয়াক ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল জ্যোতির্বিদ্যা বা চিকিৎসা বিষয়ক অনেক বই। আব্বাসীয় খলিফাদের শাসনে আসতে সাহায্য করেছিল বিভিন্ন পারসিক গোষ্ঠী, ফলে তাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা আব্বাসীয়রা করেছিলেন। সাম্রাজ্যের সরকারি ভাষা ছিল আরবি, তাই পাহলভি থেকে আরবিতে বিভিন্ন বইয়ের অনুবাদে সরকারিভাবেই পৃষ্ঠপোষণা করা হয়েছিল। সেই সময়েই গ্রিক ও ভারতীয় বইগুলির আরবিতে অনুবাদ শুরু হয়।

একই সঙ্গে এক নতুন প্রযুক্তি আরবদের হাতে আসে, তা হল কাগজ তৈরি। চিন অনেকদিন আগেই কাগজ উদ্ভাবন করেছিল। ৭৫১ সালে প্রথম আব্বাসীয় খলিফা আল-সাফার (শাসনকাল ৭৫০-৭৫৪ সাল) সৈন্যদল আধুনিক কিরগিজিস্থানে চিনা সেনাকে পরাজিত করে। যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে কাগজ বানাতে দক্ষ কিছু সৈন্য ছিল, তাদের সাহায্যে সমরখন্দে তৈরি হয় আরব দুনিয়ার প্রথম কাগজ কল। একই সঙ্গে

আঠা, রঙ, কালি ইত্যাদিরও অনেক উন্নতি ঘটে, ফলে বই অনেক সহজলভ্য হয়।

অষ্টম শতাব্দীতে অনুবাদের কাজে যে জোয়ার এসেছিলে, তাতে ভাঁটা পড়ে দুই শতাব্দী পরে। তার কারণ আরব বিজ্ঞান তখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, প্রাচীন গ্রিক বা ভারতীয় বিজ্ঞানকে অনেক ক্ষেত্রেই তা অতিক্রম করে গেছে। এর ফলে মৌলিক গবেষণার উপর জোর পড়ে, এবং অনুবাদের প্রয়োজন ফুরোয়। ইসলামি সভ্যতা যখন বন্ধ্যা যুগে প্রবেশ করে, তখন আবার আরবি ভাষাতে লেখা জ্ঞানবিজ্ঞানের বই লাতিনে অনুবাদ হয়। প্রাচীন গ্রিক লেখাও আরবের মাধ্যমেই ইউরোপের পণ্ডিতদের কাছে পৌঁছোয়; সে সময় ইউরোপে প্রাচীন গ্রিক পড়ে উদ্ধার করার মতো কেউ ছিল না। অনেক গ্রিক বইয়ের মূল পাঠও হারিয়ে গিয়েছিল, পরেও তাদের আর পাওয়া যায়নি। সংস্কৃত বইয়ের ক্ষেত্রেও এই ঘটনা ঘটেছে। স্পেনের টলেডো শহর ছিল আরব জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যতম কেন্দ্র, সেটি খ্রিস্টানদের দখলে আসার পরে আরবি গ্রন্থের লাতিন অনুবাদে জোয়ার আসে। এভাবেই আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা হয়েছিল, কিন্তু সে আলোচনা এই লেখার পরিধির বাইরে। শুধু একটা উদাহরণ দিই, সৌরকেন্দ্রিক বিশ্বের প্রস্তাব করা কোপার্নিকাসের যে বিখ্যাত বই আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা করেছিল বলে মনে করা হয়, সেই 'ডে রিভলিউশনিবাস অরবিটাম সেলেস্টিয়াম' বইতে আরবি পণ্ডিত আল-বাত্তানির উল্লেখ আছে তেইশ বার।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুবাদ যথাসম্ভব মূলানুগ হওয়া প্রয়োজন। পারস্যের জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র ছিল গন্ডিশাপুর (বা জন্ডিশাপুর), আরবি পণ্ডিতরা সেখান থেকেই অনুবাদ গ্রন্থগুলি পেয়েছিলেন। আরবি অনুবাদকরা যখন দেখলেন যে পাহলভি বা সিরিয়াক ভাষার বইগুলি আসলে মূল সংস্কৃত বা গ্রিক থেকে অনুবাদ, তখন তাঁরা সেগুলি সরাসরি অনুবাদের দিকে মন দিলেন। খলিফা হারুন আল-রশিদ (শাসনকাল ৭৮৬-৮০৯) এই কাজে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। বিশেষ করে গ্রিক গ্রন্থের প্রথম অনুবাদকরা প্রায় সবাই ছিলেন ইহুদি বা খ্রিস্টান। অন্যদিকে সরাসরি সংস্কৃত অনুবাদ অনেক সময়েই ভারতীয় পণ্ডিতদের দিয়েই করানো হয়েছিল বা তাঁদের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল।

জ্যোতিষ বিষয়ক বইগুলি প্রথমেই আরবিতে অনুবাদ হয়েছিল। সেই সময় পারসিকরা ছিলেন জরাথুস্ত্রের অনুসারী, তাঁরা তখনও ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করেননি। জ্যোতিষ ছিল তাঁদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আরবরা জ্যোতিষ পছন্দ করত না, কারণ তা ইসলাম বিরোধী। খলিফা আল-মনসুর জ্যোতিষে বিশ্বাস করতেন; কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন তিনি পারসিক উচ্চ শ্রেণিকে আরও কাছে আনার জন্য জ্যোতিষের পৃষ্ঠপোষণা করেছিলেন। খলিফার দরবারে জ্যোতিষী নিয়োগ হয়েছিল, তারা কোষ্ঠী বিচার করত। আল-মনসুর বাগদাদে নতুন রাজধানী তৈরি শুরু করার জন্য তিনজন জ্যোতিষীর থেকে শুভ মুহূর্ত জেনে নিয়েছিলেন। জ্যোতিষ ও জ্যোতির্বিজ্ঞান তখনও হাত ধরাধরি করে চলত, এই তিনজন জ্যোতিষীর একজন, আল-ফাজারি (৭৪৬-৮০৬), আরব দুনিয়ার প্রথম অ্যাস্ট্রোলেব বানিয়েছিলেন। জ্যোতিষের প্রতি আকর্ষণ থেকে শুধু পাহলভি নয়, সরাসরি সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করাও শুরু হয়েছিল। কেউ কেউ মনে করেন যে আল-ফাজারিই ব্রহ্মগুপ্তের (আনুমানিক ৫৯৮-৬৬৮) লেখা ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত প্রথম আরবিতে অনুবাদ করেছিলেন। সম্ভবত বইটির পাহলভি রূপান্তর থেকেই আরবিতে অনুবাদ হয়। আরবি ভাষায় এর নাম ছিল সিন্দহিন্দ, এবং টলেমির আলমাজেস্ট এবং ইউক্লিডের এলিমেন্টস-এর মতোই ছিল আরব বিজ্ঞান চর্চাতে এর প্রভাব। এক কাহিনিতে আছে একদল ভারতীয় জ্ঞানী ব্যক্তি কঙ্ক নামের এক চিকিৎসকের নেতৃত্বে খলিফা আল-মনসুরের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তাঁদেরই মারফত ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত খলিফার দরবারে পৌঁছেছিল এবং কঙ্ক সেটিকে পাহলভিতে অনুবাদ করেন। তবে বিখ্যাত পণ্ডিত আল-বিরুনি (৯৭৩-১০৪৮) সহ পরের যুগের অনেকেই এই কাহিনির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। জ্যোতির্বিদ্যার আরও বহু বই সংস্কৃত থেকে আরবিতে অনুবাদ হয়েছিল।

আল-মনসুরের রাজত্বকালেই ব্রহ্মগুপ্তের বই খণ্ডখাদ্যক অনুবাদ করেন ইয়াকুব বিন তারিক, তার নাম হয় আল-আরকন্দ। আল-বিরুনি ভারতে এসেছিলেন, তিনি মূলতানে পণ্ডিত দুর্লভের থেকে জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত বই 'করণ তিলক' সংগ্রহ করে অনুবাদ করেন, নাম দেন 'ঘুররত আল-জিজাত'।

জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গেই ভারতীয় গণিত আরবে প্রবেশ করেছিল। ত্রিকোণমিতিতে সুপরিচিত সাইন অপেক্ষক (Sine function)-এর নাম এল কোথা থেকে? আর্যভাটের বিখ্যাত বই আর্যভাটিয় আরবি ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল, সেখান থেকেই সাইন অপেক্ষক আরবি গণিতে প্রবেশ করে। সংস্কৃতে শব্দটি ছিল জ্যা-অর্ধ, সংক্ষিপ্ত আকারে তাকে বলা হত জিভা। আরবিতে 'ভ' উচ্চারণ নেই, ফলে তা হয়ে দাঁড়ায় জিবা। এর পরে লেখার সময় স্বরবর্ণ না লিখে তাকে সংক্ষেপে দুটি ব্যঞ্জনবর্ণের সাহায্যে লেখা হল, যাকে রোমান অক্ষরে লিখলে হয় jb। লাতিনে অনুবাদের সময় ভুল করে তাকে পড়া হয় jayb, যার অর্থ পকেট। পকেটকে লাতিনে বলে sinus, যার থেকে শেষ পর্যন্ত sine শব্দটির আবির্ভাব।

বিশেষ করে বলতে হয় ভারতীয় সংখ্যাপাতনের পদ্ধতির কথা, দশটি চিহ্ন ব্যবহার করে যে কোনও সংখ্যা লেখার বর্তমান পদ্ধতিটি ভারতীয়দেরই উদ্ভাবন, যদিও অনুরূপ পদ্ধতি আগে অন্যত্র ব্যবহার হয়েছিল বলে জানা গেছে। মূলত সিন্দহিন্দ ও আল-আরকন্দের থেকেই আরবে এই পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়। আরবি পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ, আধুনিক বীজগণিতের অন্যতম স্রষ্টা, আল-খোয়ারিজমি (আনুমানিক ৭৮০-৮৫০); তাঁর লেখার অনুবাদের মাধ্যমে সংখ্যাপাতনের এই পদ্ধতি ইউরোপে পৌঁছোয় এবং আরবি পদ্ধতি নামে পরিচিত হয়। আরবি বইতে অবশ্য সব সময়েই একে ভারতীয় পদ্ধতি বলা হয়েছে, যেমন আল-কিন্দির সংখ্যাপাতন সংক্রান্ত বইয়ের নাম ছিল কিতাব ফি ইস্তিমাল আল-আদাদ আল-হিন্দি। আল-খোয়ারিজমির এই সংক্রান্ত বইয়ের নাম ছিল সম্ভবত কিতাব আল-আদাদ আল-হিন্দি যার লাতিন অনুবাদের নাম অ্যালগরদমি দে নুমেরো ইন্ডোরাম। বিখ্যাত গণিতবিদ লাপ্লাসের বইতেও একে ভারতীয়দেরই উদ্ভাবন বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে সংখ্যাপাতনে শূন্যের ব্যবহার ভারতীয়রা ব্যাপকভাবে শুরু করলেও অনেক আধুনিক ঐতিহাসিক চিনে এর প্রথম ব্যবহারের ছাপ পাওয়া গেছে বলে দাবি করেছেন। আবার দশমিক পদ্ধতি যে বহু দেশেই স্বাধীনভাবে ব্যবহার শুরু হয়েছিল তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য মীরা নন্দার Science in Saffron বইটি দ্রষ্টব্য। তবে বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ব্যবহৃত সংখ্যাপাতন পদ্ধতি যে আরবের মাধ্যমে ভারত থেকেই ইউরোপে গিয়েছিল তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

অপর যে বিজ্ঞানের অনুবাদ বিশেষ করে আরবি বিজ্ঞানকে প্রভাবিত করেছিল, তা হল চিকিৎসাবিজ্ঞান; আরও নির্দিষ্ট করে বললে চরক ও সুশ্রুত সংহিতা। এদের মধ্যে প্রথমটিতে ঔষধ ও দ্বিতীয়টিতে অস্ত্রোপচার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। চরক বা সুশ্রুতের নামে প্রচারিত হলেও এগুলি সম্ভবত বিভিন্ন সময়ে অনেকের অবদানে রচিত হয়েছিল। গ্রিক চিকিৎসা বিজ্ঞান মূলত গ্যালেনের গবেষণার উপরে নির্মিত; দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে ভারতীয় সংহিতা দুটি গ্যালেনের থেকে অনেকদিকেই উৎকৃষ্টতর ছিল। অবশ্য তিনি এও দেখিয়েছেন যে পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যধর্ম কেমনভাবে ভাববাদ ও জাতপাত ব্যবস্থাকে এই দুইয়ের উপরে চাপিয়ে তাদের বিজ্ঞানচিন্তাকে পিছনে ঠেলে দিয়েছিল; তবে সে ইতিহাস আমাদের আলোচনার বাইরে।

সুশ্রুত সংহিতার অনুবাদ করেছিলেন মাণিক্য (বা মানক) নামের এক ভারতীয় চিকিৎসক, কথিত আছে হারুন আল-রশিদের চিকিৎসার জন্য তাঁকে বাগদাদে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কিতাব-উল-সুস্রুদ নামে এই অনুবাদটি পরিচিত। তিনি ভারতীয় ওষুধের বিষয়ে একটি বইয়েরও অনুবাদ করেন। মাণিক্য হয়তো চরক সংহিতাও পারসিক ভাষায় অনুবাদ করছিলেন। পারসিক থেকে সেটি আরবিতে অনুবাদ

করেন আবদুল্লা বিন আলি আল-দানদানি। ভাগবত রচিত অষ্টাঙ্গহৃদয় বইটি অনুবাদ করেন বাগদাদ হাসপাতালের প্রধান ইবন দাহান। তাঁর আসল নাম ধনপতি, ভারত থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আরও অনেকগুলি চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত সংস্কৃত গ্রন্থ বিভিন্ন সময় আরবিতে অনুবাদ হয়েছিল। আরবিতে ব্যবহৃত বেশ কিছু ওষুধ বা চিকিৎসা বিষয়ক শব্দের উৎস সংস্কৃত ভাষা, যেমন স্যাণ্ডাল (চন্দন), কফুর (কর্পূর) ইত্যাদি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বইগুলি কেমনভাবে আরবি বিজ্ঞানকে প্রভাবিত করেছিল, তার বিস্তারিত আলোচনা এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে সম্ভব নয়। মধ্যযুগের বিখ্যাত চিকিৎসক আল-রাজি (আনুমানিক ৮৬৫-৯২৫), আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার জনক বলে পরিচিত ইবন সিনা বা আভিসেন্না (৯৮০-১০৩৭), প্রমুখ তাঁদের বইতে আয়ুর্বেদ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। আল-তাবারি (৮৩৯-৯২৩) তাঁর ফিরদৌস আল-হিকমা বইতে ভারতীয় ও গ্রিক চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন।

এই পরিমাণে না হলেও কিছু ভারতীয় বইয়ের অনুবাদ চিনা ভাষায় হয়েছিল। মূলত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ হলেও বিজ্ঞানের বইও বাদ যায়নি। তার ইতিহাসও সুপ্রাচীন। সম্ভবত খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মাতঙ্গীসূত্র চিনা ভাষায় অনুবাদ করেন চু লু-ইয়েন ও চি-চিয়েন, সেই গ্রন্থে জ্যোতির্বিদ্যার পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ ছিল। তবে শুধু অনুবাদ নয়, সেখানে তাঁরা নিজেদের কিছু পর্যবেক্ষণও লিপিবদ্ধ করেছিলেন। মহারত্নকূটসূত্রে বড় বড় সংখ্যা লেখার পদ্ধতি বর্ণনা করা ছিল। ইয়ুহে-ফো-সোউ-না (উপশূন্য) নামের এক ভিক্ষু ষষ্ঠ শতাব্দীতে সেটির অনুবাদ করে নাম দেন তা পাও চি চিং। সপ্তম শতকে লেখা চিনের ইতিহাসে বেশ কিছু বইয়ের নাম পাওয়া যায় যাদের শুরু হয়েছিল পো-লো-মেন এই শব্দ দিয়ে। পো-লো-মেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, সে যুগে চিনে ভারতীয় বইকে এই নামেই ডাকা হত। পো-লো-মেন থিয়েন ওয়েন চিং অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জ্যোতির্বিদ্যা, পো-লো-মেন সুয়ান ফা বা ব্রাহ্মণ গণিত, পো-লো-মেন ইন ইয়াং সিয়ান লি বা ব্রাহ্মণ পঞ্জিকা, পো-লো-মেন ইয়াওফ্যাং বা ব্রাহ্মণ জ্যোতির্বিদ্যা, এমন নানা বইয়ের নাম পাওয়া গেলেও তারা কোন বইয়ের চিনা ভাষায় অনুবাদ, অনুবাদক কে ইত্যাদি জানার কোনও উপায় নেই।

আরব বলতে যেমন আমরা আধুনিক ভূগোলের বাইরের এক বিশাল ভূখণ্ডকে বুঝিয়েছি, তেমনি প্রাচীন ভারত বলতেও এখানে ভারত পাকিস্তান আফগানিস্থান উজবেকিস্থান তাজিকিস্থান সহ এক বিরাট অঞ্চলের কথাই বলছি। যেমন পু খেং বা অমোঘবজ্রের জন্ম হয় বর্তমান উজবেকিস্থানের সমরখন্দে, তিনি সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ জ্যোতিষ থেকে অনুবাদ করে যে বই লেখেন তার নাম ছিল সি চিয়াও চিং। শুধু যে চিনা পণ্ডিতরা বই অনুবাদ করেছিলেন তা নয়, ভারত থেকে পণ্ডিতরা গিয়ে চিনের সম্রাটদের অধীনে বংশপরম্পরায় কাজ করেছেন। এরকম তিনটি বংশের কথা জানা আছে, তারা হল কুমার, কাশ্যপ ও গৌতম। বিশেষ করে গৌতম বংশ দীর্ঘদিন প্রধান জ্যোতির্বিদের পদ নিজেদের দখলে রেখেছিল। মৌলিক কাজের পাশাপাশি এই সমস্ত বংশের মানুষরা সংস্কৃত থেকে মূল পুঁথি অনুবাদ করে সেগুলি নিজেদের বইতে রেখে দিতেন। যেমন চুথান সি তা (গৌতম সিদ্ধার্থ) অষ্টম শতকের প্রথমভাগে নবগ্রহ পঞ্জিকা অনুবাদ করে চিনের জ্যোতির্বিদ্যার বিশ্বকোষে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। প্রাচীন চিনের জ্যোতির্বিদ্যার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের সব থেকে বড় উৎস হল সেই গৌতম সিদ্ধার্থের সংকলিত বিশ্বকোষ।

আরবির ও চিনের অনুবাদের ইতিহাসের এক মৌলিক পার্থক্য আছে; চিনে পরবর্তীকালে জ্যোতির্বিদ্যা বা গণিতে এদের কোনও ছাপ পড়েনি। উদাহরণ স্বরূপ গৌতম সিদ্ধার্থের বইতে একটি ত্রিকোণমিতির টেবিল ছিল যেটি স্পষ্টতই সংস্কৃত উৎস থেকে নেওয়া, এবং সেটিই চিনে ত্রিকোণমিতির প্রথম নিদর্শন। অথচ এর পরের আড়াইশো বছরে চিনে ত্রিকোণমিতি ব্যবহারের কোনও নিদর্শন নেই। এই পার্থক্যের

কারণ কী হতে পারে? একটা কারণ সম্ভবত এই যে আরব সভ্যতার উষালগ্নে জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার বিশেষ কোনও পরম্পরা ছিল না। ফলে গ্রিক, রোমান, চিনা বা ভারতীয় উৎস থেকে পাওয়া জ্ঞানকে আত্মীকৃত করতে তার কোনও অসুবিধা হয়নি। হয়তো চিনের সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাস বাইরে থেকে আসা জ্ঞানকে নিজের করে নিতে বাধা দিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে অন্য একটি কথাও মনে হয়। আরবি ভাষাতে অনুবাদের সূত্রেই পরের যুগের পণ্ডিতরা প্রাচীন যুগকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন। হাজার বছর ব্যাপী অন্ধকার যুগের পরে আমাদের দেশে আধুনিক বিজ্ঞান এসেছিল ইউরোপিয় ঔপনিবেশিকদের হাত ধরে, কিন্তু শিক্ষার বাহন ছিল বিদেশি ভাষা। ভারতীয় ভাষাতে আধুনিক বিজ্ঞানের বই অনুবাদের প্রয়াস বিশেষ হয়নি, এখন যে সেদিকে বিশেষ জোর পড়েছে তা নয়। এই কারণেই হয়তো আমাদের দেশে বিজ্ঞান সংস্কৃতির শিকড় খুব গভীরে যায়নি; বিদেশি ভাষাতে লেখা বিজ্ঞান সাধারণ মানুষের কাছে অবোধ্যই থেকে গেছে। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষার পক্ষে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি।

এই লেখাতে যেসব বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

Abdul Ali, *Indian origins of Arab-islamic Scientific and Literary Heritage* (Prints Publication, 2022)

অমর্ত্য সেন, তর্কপ্রিয় ভারতীয় (আনন্দ, ২০০৭)

Debiprasad Chattopadhyay, *History of Science and Society in Ancient India* (K P Bagchi and Co, 1977)

Jim Al-Khalili, *Pathfinders : The Golden Age of Arabic Science* (Allan lane, 2010)

Joseph Needham, *Science and Civilization in China*, Vol. 2 (Cambridge University Press, 1956)

গৌতম গঙ্গোপাধ্যায় : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। বর্তমানে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব।